ব্যক্তি কুমুদরঞ্জন ও কবি কুমুদরঞ্জন

জগদিন্দ্র নারায়ণ লাহিড়ী

ব্যক্তি কুমুদরঞ্জন মল্লিক ঃ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বর্ণ পরিচয় না প'ড়ে কোনও বাঙালী ছেলেমেয়ের বাল্যশিক্ষা শুর কথা আজ যেমন কল্পনা করাও যায় না, ঠিক তেমনি কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের কোনও কবিতার সঙ্গে কোনও না কোনোভাবে পরিচিত না হয়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষা-জীবন শেষ করেছে, এরকম কোনও বাঙালী ছাত্র বা ছাত্রীর কথাও আমরা ভাবতে পারিনা। বিগত পঞ্চাশ বৎসরেরও বেশী সময় ধরে তাঁর কবিতা বিদ্যালয়-স্তরে পাঠ্য আছে এবং গত শতাব্দীর ছয়ে'র এবং সাতে'র দশকে কলেজ স্তরেওনার কবিতা পাঠ্য ছিল। অথচ খুবই দুঃখের বিষয়, এরকম একজন কবির ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে আমাদের জানার পরিধি খুবই সীমিত। বিদ্যালয়ের পাঠ্য-পুস্তকে যে কবি-পরিচি তি দেওয়া থাকে, সঙ্গত কারণেই তা খুবই সংক্ষিপ্ত। তা ছাড়া সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে প্রকাশিত বইতে প্রায়ই তাঁর জন্ম-মৃত্যুর তারিখ পর্যন্ত সঠিক ভাবে উল্লেখ করা হয় না। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা শ্রেণী কক্ষে শিক্ষক -শিক্ষিকাদের কাছে থেকেও ব্যক্তি কুমুদরঞ্জন সম্পর্কে খুব বেশী কিছু জানতে পারে না। তারপর, বিদ্যালয় ত্যাগের পর বরবর্তী পর্যায়ের লেখাপড়ার চাপে কুমুদরঞ্জনের কবিতার দুই-একটি পংক্তি তাদের মনে থাকলেও ব্যক্তি কুমুদরঞ্জনকে তারা একরকম ভুলেই যায়।

আমাদের কাছে কুমুদরঞ্জন শুধু আধুনিক শ্রেষ্ঠকবিদের একজন মাত্র নন। প্রথমতঃ, তিনি আমাদের খুব কাছের মানুষ, একান্ত আপনজন, একজন সহজ, সরল, অনাড়ম্বর জীবনযাপনকারী আদর্শ শিক্ষাবিদ্। আমরা যে অঞ্চলের অধিবাসী, সে অঞ্চলেই আমাদের পরিচিত পরিবেশে তিনি তাঁর জীবনের দীর্ঘ ৮৭ বৎসর অতিবাহিত করেছেন। তাঁর ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে আলোচনা আজও আমাদের কাছে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং কর্তব্য বলে মনে হয়।

১৮৮৩ সালের ৩ মার্চ (বাংলা ১২৮৯ সালের ১৯শে ফাল্গুন) বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট থানার কোগ্রামে কুমুদরঞ্জন মল্লিক তাঁর মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। অজয় এবং কুনুর নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত এটি একটি প্রাচীন এবং ঐতিহ্যবাহী গ্রাম। কবির নিজের কথায় আমি যে গ্রামে জন্মগ্রহণ করি, তাহা ছোট হইলেও মগণ্য নহে। পুরাণ ও কাব্যকাহিনী উহাকে মহিমান্বিত করিয়াছে। এই গ্রামের প্রাচীন নাম ছিল উজানী। এই গ্রাম বৈষ্ণব কবি লোচন দাসের জন্মভূমি। কবি কঙ্কনের চ ণ্ডীমঙ্গল কাব্য এই গ্রামেরই ইতিহাস। শ্রীমন্ত সওদাগর এবং সতী বেহুলাও এই গ্রামেই জন্মেছিলেন।

বিভিন্ন পৌরাণিক গ্রন্থে এই গ্রামের নাম পাওয়া যায়। এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করে কবি নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান বলে মনে করতেন এবং তাঁর রচনায় এই গ্রামের কীট-পতঙ্গ, পশু-পাখী, বৃক্ষলতা,ফুল-ফল, নদ্নদী এবং তাঁর একান্ত আপন সাধারণ মানুষজনকে অমর করে রেখে গেছেন।

কুমুদরঞ্জনের পিতার নাম ছিল পূর্ণচন্দ্র মল্লিক এবং মাতার নাম ছিল সুরেশ কুমারী দেবী। মল্লিক পরিবারের পৈতৃক নিবাস ছিল শ্রীখণ্ডে, তবে কুমুদরঞ্জন তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের সিংহভাগই কাটিয়েছেন কোগ্রামে যার বর্তমান নাম কবির নাম অনুসারে করা হয়েছে 'কুমুদগ্রাম'। পিতা পূর্ণচন্দ্র মল্লিকের জীবন-কাহিনী আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি। তিনি সুদূর কাশ্মীরে তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবন অতিবাহিত করেন। তাঁর মাতাও পিতার কর্মস্থলেই থাকতেন। কুমুদরঞ্জন তাঁর দিদিমা এবং মামীমাদের কাছেই পরম আদরে মানুষ হয়েছিলেন। তাঁর দিদিমা তাঁকে খুবই ভালবাসতেন। কুমুদ ছিলেন তাঁর নয়নের মণি। মা-বাবাকে কুমুদরঞ্জন দেবতার ন্যায় জ্ঞান করতেন। তিনি নিজেই বলেছেন, আমাকে ভালবাসিতেন বাবাই বেশী, কিন্তু আমি মা বলিতেই অজ্ঞান। আমার মা'র মত পুণ্যময়ী, ভক্তিমতী, স্নেহময়ী জননী পাওয়া সত্যিই দুর্লভ'।

যে মাতামহীর স্নেহ-ছায়ায় কুমুদরঞ্জনের বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়েছিল, তাঁর সম্বন্ধে যা জানতে পারা গেছে, তা হলো-- তিনি অত্যন্ত সহজ-সরল এবং সাধা-সিধা মানুষ ছিলেন। তিনি ছিলেন দেব-দেবতায় বিশ্বাসী। সেকালের গ্রামের সাধারণ মানুষের মনে যে সব কু-সংস্কার বাসা বেঁধে থাকতো, তা থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন না। তাঁর সব সময় ভয় ছিল, পাছে তাঁর আদরের নাতি কুমুদ কারও কু-নজরে পড়ে।

অঞ্চলের একটি প্রাচীন গ্রামে স্নেহময় পরিবেশে কুমুদরঞ্জনের বাল্যজীবন অতিবাহিত হতে থাকে এবং যথা সময়ে গ্রামের পাঠশালার গুরুমশাই এর নাম ছিল বঙ্কুবিহারী রায়। রায় মশাই নিজে একজন ভক্ত এবং সাধক প্রকৃতির লোক ছিলেন। ছাত্রদের মনে ভক্তির বীজ বপন করা তিনি তাঁর কর্তব্য বলে মনে করতেন। আমাদের মনে হয় লোচন দাসের ভিটের এবং আখড়ার কাছে থেকে ধর্মভীরু এবং ভক্তিমতী মা -দিদিমাদের সান্নিধ্য লাভ করে এবং বঙ্কুবিহারী রায় মশাই-এই প্রভাবে কুমুদরঞ্জনের নিজের অজান্তেই তাঁর ধর্ম বিশ্বাস প্রভৃতি বাসা বাঁধে এবং পরবর্তী জীবনে সে বিশ্বাস শিথিল না হয়ে বরং আরও দৃঢ় হয়ে ওঠে।

কুমুদরঞ্জনের মাতামহী তাঁর নাতির শিক্ষার জন্য কলকাতার শাঁখারীটোলায় ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন এবং পাঠশালায় শিক্ষা শেষ হবার পরই কুমুদরঞ্জনকে সেখানে পাঠানো হয়। ১৮৯৫ সালে কলকাতার ডি.এন.দাসের সেঞ্চুরি স্কুলে তাঁর উপরের শ্রেণীতে পড়তেন উষানাথ সেন। পরবর্তীকালে আই.সি.এস। কলকাতায় ভাড়া বাড়ীতে থাকার সময় বালক কুমুদরঞ্জন খুবই মনমরা হয়ে থাকতেন। সব সময়ই তাঁর মন পরে থাকতো গ্রামের সেই শান্ত-স্নিগ্ধ পরিবেশে। তাঁর সুযোগ্য পুত্র প্রয়াত জ্যোৎস্নানাথ মল্লিক কবির এই সময়ের মনোভাব বোঝানোর জন্য কবির একটি কবিতা উল্লেখ করেছেন। কবিতাটি হলো

প্রবাসী বা বনবাস

"বনবাস মোর শেষ হবে কবে, জান যদি কেহ কহরে। / চৌদ্দ বরষ রয়েছি যে আমি মোর গ্রাম ছাড়ি শহরে।/ কোথা কসকসে কাঁকরের ক্ষেত, ছোলামটরের ভুঁই মা,/ রাজা হব কোথা,বিমাতার মতো বনে পাঠাইলি তুই মা ?"

আজ থেকে শতাধিক বছর পূর্বে বর্ধমানের এক প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে কলকাতায় পড়তে যাওয়া সম্পর্কে কুমুদরঞ্জন পরবর্তীকালে বলেছেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বৎসরেই (১৮৫৭) তাঁদের গ্রাম থেকে প্রথম এন্ট্রান্স পরীক্ষায় একজন উত্তীর্ণ হন। আমাদের ভাবতে ভাল লাগে যে অশিক্ষা এবং কু-সংস্কার যে সময় বাংল

ার উন্নতির প্রধান অন্তরায় ছিল সেই সময় এই গ্রামের অধিবাসীরা উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন।এই প্রসঙ্গে একজনের কথা কুমুদরঞ্জন অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করতেন। তিনি হলেন সে আমলের কোগ্রামের বাসিন্দা যতীন্দ্রনাথ মল্লিক। যতীন্দ্রনাথ এবং তাঁর ভ্রাতা ক্ষেত্রনাথই উদ্যোগী হয়ে কুমুদরঞ্জনের এবং তাঁর ভ্রাতার কলকাতায় পড়াশোনার ব্যবস্থা করেন। সে যুগে যতীন্দ্রনাথ গ্রামের ছেলে হয়ে ভাল ফল করে Executive Engineer -এর পদে কর্মরত অবস্থায় অবসর গ্রহণ করেন । এই যতীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে কুমুদরঞ্জন লিখেছিলেন--

'উজানি আজ শূন্য আঁধার উঠছে হাহাকার তুমি তাহার স্বর্ণপ্রদীপ তুমি যে নাই আর। স্বর্গবাসী হে মহাভাগ। ভিক্ষা মাগি পায় আবার যেন জন্ম নিয়ো আমাদের এই গাঁয়'

সেঞ্চুরি স্কুলের নবম শ্রেণীতে পাঠরত অবস্থাতেই তাঁর প্রথম কবিতা ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির নাম নবভারত আর কবিতার নাম 'অন্ধ'। অন্ধ কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস -এর উদ্দেশ্যে কবিতাটি রচিত হয়েছিল। অনেকেই মনে করেন, এই কবিতায় ইংরেজ কবি Tomas Grey র প্রভাব আছে। অন্ধ মিলটনের উদ্দেশ্যে Grey ব লেখা কবিতাটি সে সময় Entrance -এ পাঠ্য ছিল কিনা জানি না, তবে একজন নবম শ্রেণীর ছাত্র এই কবিতা পাঠ করেছে এবং তার প্রভাবে কবিতা লিখেছে এবং তা কলকাতা থেকে প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, এটা কম গৌরবের কথা নয়। কবিশেখর কালিদাস রায় কবিতাটিকে তাঁর শ্রেষ্ঠকবিতার সংকলনে স্থান দিয়েছেন। এখানে কবিতাটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হলো--

অন্দ আমি রে অন্ধ ! . বন্দী আমার এ তনু কারার সিংহ-দুয়ার বন্ধ/প্রবেশ নিষেধ রবি ও শশীর /চারিদিকে ঘন গণ্ডী সমীর /সেথায় আলোক রূপ ও রঙের নাই প্রবেশের রন্ধ্র।/

কাড়িয়া লয়েছ দৃষ্টি/ হে সৃষ্টিধর দেখিতে দিলে না সুন্দর তব সৃষ্টি।/ তব মহিমার বহিঃপ্রকাশ/ দেখিতে দিলে না মোরে নীলাকাশ/ বুঝালে জগৎ জগদীশ একই মিটায়ে সকল ধন্দ।

বুঝিলে ইহার অর্থ, / শুধু ছোট দুটি কালো বর্ত্তুল জীবন করিবে ব্যর্থ?/ দরশনে যদি এতই কৃপণ/ চাহি না তা, দাও তবপরশন/ সর্ব অঙ্গে সুধা সিঞ্চনে ঘুচাও মনের দ্বন্দ্ব।

আমরা যতদুর জানতে পেরেছি, ১৯০০ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল থেকে কুমুদরঞ্জন এনট্রান্স পাশ করেন। এই সময়েই শ্রীখণ্ডের যুগোল কিশোর রায়ের দ্বিতীয়া কন্যা সিন্ধুবালা দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। কুমুদরঞ্জন পরবর্তীকালে বলেছেন, আমার বাড়িও শ্রীখণ্ডে আরশ্বশুরবাড়িও শ্রীখণ্ডে'।

এনট্রান্স পাশ করার পর তিনি কোন্ কলেজ থেকে এফ. এ. পাশ করেন, আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব হয় নি। তবে তিনি যে বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্র ছিলেন, তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি। কলেজে পড়ার সময় বন্ধুদের মধ্যে তাঁর কবি-পরিচিতি প্রচার হওয়ায় শ্রেণী কক্ষে তাঁকে ঘিরে বন্ধুরা মাঝে মাঝেই গল্পগুজব করতো। সে সময় বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন বিখ্যাত গিরীশ বোস মহাশয়। কুমুদরঞ্জনকে ঘিরে বন্ধুদের হৈ -হল্লা একদিন গিরীশ বোসের নজরে পড়ায় তিনি কুমুদরঞ্জনকে Kneel down করে শাস্তি দিয়ে যান। কলেজের অন্যতম অধ্যাপক হুইলার সাহেব (যিনি পরবর্তীকালে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে সুনাম অর্জন করেন) তখন ঐ কক্ষের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। কুমুদকে শাস্তি দিয়েছেন, ছেলেদের কাছ থেকে জানতে পেরে তিনি তৎক্ষণাৎ অধ্যক্ষের কাছে গিয়ে জানান যে, কুমুদ একজন প্রকৃত ভাল ছাত্র। ওকে এভাবে শাস্তি দেয়া উচিত হয়নি। অধ্যক্ষ মশাই সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে কুমুদের শাস্তি মকুব করে দিয়েছিলেন। বি.এ.পরীক্ষায় কুমুদরঞ্জন প্রথমবার পাশ করতে পারেন নি। তাঁর অকৃতকার্যে তিনি যতটা বিস্মিত হন, তার চেয়ে বেশী বিস্মিত হন তাঁর অধ্যাপকেরা । অনেকে অনুমান করেন, ছাত্রজীবনে কবি খ্যাতি হওয়ায় এবং কবিতা লেখায় সময় ব্যয় হওয়ায় পরীক্ষার প্রস্তুতিতে হয়তো কিছুটা শিথিলতা এসে থাকতে পারে। আমাদের মনে রাখতে হবে, সে আমলে শতকরা ১৬/১৭ জন মাত্র বি.এ. পরীক্ষায় কৃতকার্য হতো।

যাইহোক, পরের বৎসর অর্থাৎ ১৯০৫ সালে সিটি কলেজ থেকে কুমুদরঞ্জন বি.এ. পাশ করেন। সে সময় বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বাংলায় সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্তকে বঙ্কিমচন্দ্র পদকে ভূষিত করা হতো। কুমুদরঞ্জন এই পদক লাভ করেছিলেন। সিটি কলেজের সে সময়ের অধ্যক্ষ ছিলেন বিখাত হেরম্ব চন্দ্র মৈত্র মশাই। তিনি কুমুদরঞ্জনকে খুবই ভালবাসতেন এবং মাঝে মাঝেই তাঁকে 'Post Corner' থেকে আলাদা এনে বসাতেন, যাতে তাঁর পড়াশোনার ব্যাঘাত না ঘটে। কলেজ জীবনে অঙ্কের অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অঙ্কের ভীতি দূর করেছিলেন। অন্যান্য যে সব অধ্যাপকের কাছে তিনি পড়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশেকে কলকাতায় ছাত্র জীবন অতিবাহিত হওয়ায় সে আমলের বিদগ্ধ ব্যক্তিদের সান্নিধ্য লাভের ফলে কুমুদরঞ্জনের চরিত্রে নানাগুণের সমাবেশ ঘটেছিল এবং পরবর্তীকালে তিনি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়েছিলেন। এখানে একটা কথা স্বভাবতই আমাদের মনে আসে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সেই টাল-মাটাল অবস্থায় কলকাতায় ছাত্রজীবন কাটালেও কুমুদরঞ্জন কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রভাবিত হন নি বা কোনো আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণও করেন নি। পরোক্ষভাবেও কোনো বৃটিশবিরোধী কার্যকলাপে তাঁর অংশ গ্রহণের কথা আমরা জানতে পারিনা। আমাদের অনুমান, গ্রাম থেকে শহরে পড়তে গিয়ে পড়াশোনার মধ্যেই তিনি নিজেকে নিয়োজিত রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। খুব সম্ভবত তিনি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মতাদর্শ অনুসরণ করে কোনও অবস্থাতেই শ্রেণীকক্ষ পরিত্যাগ করেন নাই।

বি.এ. পাশ করার পর কুমুদরঞ্জনের ইচ্ছা ছিল আইন পাঠ করে আইন ব্যবসায়ে জীবন কাটাবেন। কিন্তু তা আর হয় নি। বি.এ. পাশ করার পর পরই বাড়ির কয়েক মাইল দূরে মাথন নবীনচন্দ্র বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজে যোগদান করেন। পদটি ছিল সম্পূর্ণ অস্থায়ী। স্থায়ীভাবে বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার ইচ্ছা না থাকলেও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে এই বিদ্যালয়েই সমগ্র কর্মজীবন অতিবাহিত করতে হয়। বিদ্যালয়টি কাশিমবাজার মহারাজদের পরিচালনাধীন ছিল এবং কুমুদরঞ্জনের বিদ্যালয়ে যোগদানের পরের বৎসরই মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বিদ্যালয় পরিদর্শনে আসেন। কবি হিসাবে কুমুদরঞ্জনের নাম মহারাজের শোনা ছিল এবং তিনি কুমুদরঞ্জনকে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করতে নিষেধ করেন। এই প্রসঙ্গে বিদ্যোৎসাহী মহারাজের একটি উক্তি স্মরণীয় হয়ে আছে। মাথন বিদ্যালয়ে বসে মহারাজ কুমুদরঞ্জনকে বলেছিলেন, 'কথার কারবারে কবির যাওয়া উচিত নয়'। যাইহোক, যোগদানের পরের বৎসরই তাঁর পদটি স্থায়ী হয় এবং তার পরের বৎসর প্রধান শিক্ষকের পদ খালি হওয়ায় এবং মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দীর ইচ্ছাতেই কুমুদরঞ্জন স্থায়ীভাবে এই বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসাবে কাজ করতে থাকেন। প্রথম যখন বিদ্যালয়ে শিক্ষক হয়ে কাজে যোগ দেন, তখন তাঁর মাসিক বেতন ছিল ৪০টাকা। প্রধান শিক্ষক হবার পর সেই বেতন হয় ৫০টাকা। প্রধান শিক্ষক হিসাবেএকাদিক্রমে ৩১ বৎসর একই বিদ্যালয়ে কর্মরত থেকে ১৯৩৯ সালে তিনি বিদ্যালয়ের কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তখন তাঁর বেতন হয়েছিল ৭৬টাকা।

নিজের গ্রামের পার্শ্ববর্তী বিদ্যালয়ে সুদীর্ঘ ৩১ বৎসর প্রধান শিক্ষক হিসাবে কাজ করতে গিয়ে তিনি কাশিমবাজারের মহারাজের কাছ থেকে সবরকম সাহায্য পেয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে কুমুদরঞ্জন তাঁর আত্মকথায় স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন। তবে বিদ্যালয়ের কার্যকালে অনেক সময় তাঁকে গ্রামের কারও কারও কাছ থেকে অসহযোগিতা এবং বিদ্বাচারণ সহ্য করতে হয়। একসময় তাঁর বিদ্ধবাদীরা বিদ্যালয়ে চড়াও হয়েছিলেন। এনিয়ে মামলা-মোকদ্দমাও হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত কুমুদরঞ্জনেরই জয় হয়েছিল।

কাশিমবাজারের মহারাজা যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন নিজের ইচ্ছামত ছাত্রদের চরিত্র গঠন, লেখাপড়া, ব্যায়াম ইত্যাদির যথাযথ ব্যবস্থা করে কুমুদরঞ্জন বিদ্যালয়টিকে একটি আদর্শ বিদ্যালয়রূপে গড়ে তুলেছিলেন। সে আমলে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস (হিন্দু-মুসলিম) এবং পাঠাগারকে তিনি আদর্শ-স্থানীয় রূপে গড়ে

তুলেছিলেন। আশেপাশের ছাত্ররা তো বটেই দূর-দূরান্তের ছাত্ররাও এখানে থেকে শিক্ষা লাভ করে গেছে। কুমুদরঞ্জনের সান্নিধ্যলাভ করে এই বিদ্যালয়ের যে সব ছাত্র ভবিষ্যতে কর্মজীবনে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে কৃতি হয়েছিলেন, তাঁদের কয়েকজনের কথা কবি-পুত্র (প্রয়াত) জ্যোৎস্না নাথ মল্লিক তাঁর কুমুদ প্রসঙ্গ বইতে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। এঁদের কয়েকজনের নাম হলো- ১) পাশের গ্রামের ড.আবু তোয়াব ২) আলি রেজা (কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার) ৩) পুলিন চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ৪) তারাপদ নন্দী ৫) ভোলানাথ পাল ৬) গদাধর চট্টোপাধ্যায় ৭) দুর্গাপদ শীল ৮) শক্তিপদ রায় ৯) রাধাশ্যাম দাস এছাড়া ১০) ধনপতি পাঁজা ও ১১) গণপতি পাঁজা, ১২) অন্নদাকুমার চক্রবর্ত্তী(স্বামী অসীমানন্দ) ১৩) বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়(শিলাদিত্য) প্রভৃতিও যে এই বিদ্যালয়েরই সেই সময়ের ছাত্র ছিলেন, তার উল্লেখ অনেকের লেখায় দেখা যায়। বিদ্রোহী কবি কাজী নজল ইসলাম ১ বৎসরের মত এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন, সে কথা কুমুদরঞ্জন নিজেই উল্লেখ করেছেন এবং পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং মুজঃফর আমেদের লেখাতেও এ বিষয়ে আছে।

অবসর গ্রহণের পর সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের মত সময় তিনি জীবিত ছিলেন। তাঁর সাত পুত্রের মধ্যে একজন বাল্যকালেই মারা যান। বাকি ছয় পুত্র প্রত্যেকেই জীবনে প্রতিষ্ঠিত হন। অবসর জীবনে কুমুদরঞ্জন কিন্তু স্ব-গ্রামে তাঁর অন্যান্য পরিচিত পরিবেশের মধ্যে গ্রামের সাধারণ মানুষদের নিয়ে তাদের দুঃখ-কষ্টের অংশভাগী হয়ে জীবন কাটিয়ে গেছেন। বন্যা-প্রবল এই এলাকায় অজয়ের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েও গ্রাম ছেড়ে তিনি কখনও যান নি। তাঁর দিনলিপির একদিনের লেখা একটি উক্তি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করছি। ১৯৫৯ সালের ৫ অক্টোবর তিনি লিখছেন--

"গ্রামে থাকি সেবা করিবার জন্য, সেবা পাইবার জন্য নহে। সেই জন্য কোন কিছুতে দুঃখ হয় না।"

১৯৫৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের মাধ্যমে কুমুদরঞ্জন দেশবাসী কর্তৃক সম্বর্ধিত হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে জগত্তারিনী পদকে ভূষিত করেন এবং জীবন সায়াহ্নে ভারত সরকার তাঁকে পদ্মশ্রী উপাধি প্রদান করেন।

কোগ্রামের নিভৃত পল্লীতে অজয় এবং কুনুর নদী বেষ্টিত তাঁর বহু স্মৃতিবিজড়িত গৃহে যখন তিনি তাঁর অবসর জীবন যাপন করছিলেন, সে সময় কলকাতা এবং অন্যান্য স্থান থেকে তাঁর প্রাক্তন ছাত্র , পুরচিত কবি-লেখক এবং অন্যান্য অনেকেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। অনেকে তাঁকে 'কবি ঠাকুর' হিসাবে উল্লেখ করেছেন। অনেক অপরিচিত ব্যক্তিও তাঁকে প্রণাম করে তাঁর আশীর্বাদ নেবার জন্যই তাঁর কাছে আসতেন। বর্ধমান জেলার অনেক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁকে ভাষণ দিতে যেতে হতো। অনেক ছোট-বড় পত্রিকার সম্পাদক অথবা পরিচালকরা তাঁর কাছ থেকে আশীর্বাদ নিতে আসতেন। এইভাবে যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন পরিপূর্ণ সন্তুষ্ট চিত্তে, সহজ, সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করে এই ঈশ্বর-বিশ্বাসী ভক্ত কবি সকলের শ্রদ্ধেয় হিসাবে তাঁর জীবন অতিবাহিত করে গেছেন। জীবনাবসানের কিছুদিন পূর্বে তাঁর ছোটভাই একরকম জোর করেই তাঁকে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় নিয়ে যান। সেখানেই ১৯৭০ সালের ১৪ ডিসেম্বর কুমুদরঞ্জন ইহলোক ত্যাগ করেন।

ব্যক্তিজীবনে কুমুদরঞ্জন ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষক , ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যে বিশ্বাসী, ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরশীল, সদা সন্তুষ্টচিত্ত, দৃঢ় চেতা এবং কোমল হৃদয়ের অধিকারী। সরল জীবন-যাপন এবং উচ্চ চিন্তা ছিল তাঁর জীবনের আদর্শ স্বরূপ। আমাদের এই একান্ত আপন এবং প্রিয় কবির প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

কবি কুমুদরঞ্জন

প্রাক্‌কথনঃ

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একজন খ্যাতনামা কবি হিসাবে কুমুদরঞ্জন মল্লিকের নাম আমাদের সকলের জানা। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের প্রায় প্রতিটিতেই তাঁর কথা গুত্ব সহকারে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। বিগত পঞ্চাশ বছরেরও বেশী দিন ধরে তাঁর কবিতা বাংলার প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠ্য তালিকা ভুক্তআছে এবং বিগত শতাব্দীর খুব সম্ভবতঃ সাতের দশকে মহাবিদ্যালয়েও তাঁর কয়েকটি কবিতা পাঠ্যতালিকাভুক্ত ছিল। এই সব কারণেই কুমুদরঞ্জনকে এখনও আমরা ভুলতে পারিনি। তাঁর কিছু কিছু কবিতার অংশ বিশেষ আজকের এজন্মের অনেকেই অনায়াসে মুখস্ত বলে যেতে পারে। তবে কুমুদরঞ্জনের সমগ্র রচনাবলীর মধ্যে এ যাবৎ পাঠ্য তালিকাভুক্ত হয়েছে এমন কবিতার সংখ্যা মাত্র কয়েকটি। এ গুলির বাইরে তাঁর যে আরও অনেক ভাল ভাল কবিতা আছে সেগুলির খবর আজ আমরা অনেকেই ঠিকমত রাখি না।

কুমুদরঞ্জনের সামগ্রিক রচনার প্রতি আমাদের এই অনীহার প্রধান কারণ হলো- তাঁর কবিতার বই আজ আর সহজলভ্য নয়। বিগত ১৯৮১ সালে তাঁর জন্ম-শত বার্ষিকীর প্রাক্কালে প্রকাশিত কুমুদ কাব্য মঞ্জুষা এতদিন পর্যন্ত তাঁর শেষ কবিতার বই হিসাবে গণ্য হতো। অনেক চেষ্টা করেও আমাদের কাছাকাছি কোনও পাঠাগারেই এ বই এর সন্ধান পাইনি। এর আগে কুমুদ কাব্য সম্ভার নামে একটি সংকলন ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল বলে আমরা জানতে পেরেছি। কবির জীবিত কালে এইটিই তাঁর শেষ প্রকাশিত গ্রন্থ। এ বইও আমাদের পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। পুরাতন পাঠাগারগুলিতে খোঁজ করে কুমুদরঞ্জনের যে প্রামাণ্য কাব্য গ্রন্থ আমাদের নজরে এসেছে তা হলো ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত কবিশেখর কালিদাস রায় সংকলিত "কুমুদরঞ্জন মল্লিকের শ্রেষ্ঠ কবিতা"। কলকাতার মিত্র ঘোষ প্রকাশনা সংস্থা থেকে এটি প্রকাশিত হয়েছিল। এই সংকলন গ্রন্থের কবিতাগুলি পড়তে গিয়ে আমরা যে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছি তা হলো কবিতাগুলি কালানুক্রমিক ভাবে বিন্যস্ত নয় এবং কোথায়ও মূল কাব্যগ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু তা সত্বেও কুমুদরঞ্জনের অনুরাগী পাঠকদের কাছে এই সংকলন-গ্রন্থের একটি হিবশেষ তাৎপর্য আছে। প্রথমতঃ এই বই এর দুই মলাটের মধ্যে আমাদের এই প্রিয় কবির নানা সময়ের লেখা বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় দুইশত কবিতা আমরা একসঙ্গে পেয়ে যাই। এছাড়া পরিচায়িকা শিরোনামে এই বই এর সূচনায় কবিশেখর কালিদাস রায় যে অনবদ্য ভূমিকা লিখেছেন, কুমুদরঞ্জনের কবিতা সম্পর্কে যে কোনও আলোচনায় এই ভূমিকা আমাদের দিগ্‌দর্শনের কাজ করবে বলে আমরা মনে করি। এই ভূমিকা থেকেই আমরা জানতে পেরেছি-- কুমুদরঞ্জনের সহস্রাধিক কবিতা তখন পর্যন্ত অগ্রন্থিত অবস্থায় বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকাতেই অবহেলিত অবস্থায় ছিল।

কুমুদরঞ্জনের কবিতাকে যাঁরা সত্যিই ভালবাসেন, তাঁদের কাছে একটা সুখবর হলো - অতি সম্প্রতি কলকাতার ভারতী পুস্তক প্রকাশন সংস্থা শ্রীযুক্ত গোরা সিংহ রায়ের সম্পাদনায় কুমুদরঞ্জন মল্লিকের শ্রেষ্ঠ কবিতা নামে তাঁর কবিতার একটা সংকলন প্রকাশ করেছেন। ২০০২ সালের কলকাতা পুস্তক মেলায় তাঁরা এ বই পাঠকদের হাতে তুলে দিয়েছেন। কবিশেখর কালিদাস রায় এর সারগর্ভ ভূমিকার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, সেই ভূমিকাটি এখানে পুনর্মুদ্রিত হওয়ায় নিঃসন্দেহে এ বই এর গৌরব অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। কুমুদরঞ্জনের কবিতার এই সাম্প্রতিকতম সংকলনটি যে কারণে আমাদের কাছে বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে হয়েছে তা হালা এই বই এ তাঁর কবিতাগুলি মূল কাব্যগ্রন্থের নাম সহ প্রকাশনার কাল অনুযায়ী সংকলন করা হয়েছে। ভবিষ্যতে যাঁরা কুমুদরঞ্জন সম্পর্কে গবেষণার কাজ করবেন, তাঁদের কাছে এ বই খুবই উপকারে লাগবে।

বর্তমান নিবন্ধে আমরা কুমুদরঞ্জনের কাব্যগ্রন্থগুলি প্রকাশ কাল অনুযায়ী উল্লেখ করতে চাই। উল্লেখপর্বে মূল গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য এবং সেই কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে সমসাময়িক বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অভিমত প্রদানের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ের আলোচনার শেষে ১নং সরণীতে কুমুদরঞ্জনের কাব্যগ্রন্থাদির একটি কালানুক্রমিক সূচী প্রদান করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা বিষয়-বৈচিত্র অনুযায়ী কুমুদরঞ্জনের কবিতাগুলিকে ভাগ করার চেষ্টা করেছি এবং বিভিন্ন বিষয়ের যে কবিতাগুলি আম

াদের কাছে ভাল লেগেছে, সেগুলির আংশিক অথবা সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি প্রদান করেছি। ২নং সারণিতে কুমুদরঞ্জনের কবিতার বিষয়-বৈচিত্র্য গুলি উল্লেখ করা হয়েছে।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com